বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে

পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণজাগরণ ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আবির্ভাব হয়। এই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আসে, এমনকী তাদের মধ্যে একটা অংশ নানারকম কাল্পনিক চিন্তারও শিকার হয়ে পড়ে। বিশেষ করে কমিউনিস্ট নামধারী ও উগ্র বাম দলগুলির মধ্যে চীনের ভূমিকা ও ভারত সরকারের অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা লক্ষ করে নানা বিভ্রান্তি দেখা যায় এবং এটাকে তারা তখন মুক্তিযুদ্ধ বলে মনেই করত না। এই আলোচনাতে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের আলোকে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রকৃত চরিত্র, তার নেতৃত্বের প্রশ্ন, তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীনের বিবেচনাপূর্ণ ভূমিকা, ভারত সরকারের অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করে দেখান। বিশেষ করে এই মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের কী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের পক্ষে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেই দেশে যে ভূখণ্ডের মধ্যে এই স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছে তার চারপাশেই আমাদের ভারতবর্ষ। কাজেই ঐ দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ, বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি এবং সেই দেশের সরকারের চরিত্র ও রূপ কী হবে — এ প্রশ্ন শুধু সেই দেশেরই একান্ত একটি ব্যাপার বলে দুনিয়ার অন্যান্য দেশ ভাবতে পারলেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভাবনা ধারণা এরকম হওয়া উচিত নয়। আমাদের সঙ্গে এই বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। তাদের সাথে আমাদের নাড়ির যোগ রয়েছে। সংস্কৃতির যোগ রয়েছে। বাস্তবে আমরা একদিন একদেশেরই মানুষ ছিলাম, যদিও আজ আমরা দুটো রাষ্ট্রে শুধু আলাদা নয়, দুটো জাতি, দুটো দেশে বিভক্ত।

বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের একদল লোক যাঁরা পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা এক্ষুনি আবার এক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এবং সে ধরনের আওয়াজ তুলছেন, এই প্রসঙ্গে তাঁদের একটা কথা বলা দরকার বলে আমি মনে করি। তা হচ্ছে, একদিন আমরা একদেশের মানুষ হলেও আজ কিন্তু এই দুই দেশের মধ্যে আর সেই এক জাতীয়তাবোধের ধারণা বাস্তবে বিরাজ করে না। এই দুটো দেশকে কেন্দ্র করে দুটো দেশীয় জাত্যভিমান এবং জাতীয়তাবোধ আলাদা করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষের মধ্যে যে বাঙালিত্ববোধ রয়েছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের বাঙালিত্ববোধের বিশেষ মিল আছে, একথা ঠিক। কিন্তু আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত মিল ছাড়া তাদের জাতীয়তাবোধ আমাদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি আলাদা জাতীয়তাবোধ। একথা যেন আমরা কোনওমতেই ভুলে না যাই। তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্ব আমাদের কাছে যতই হোক, এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাবার সাথে সাথে এই কথাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ তার আলাদা সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা নিয়েই আলাদাভাবে বিরাজ করতে চাইছে। ফলে তাদের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের জাতীয় জীবনের বিকাশে সাহায্যের মনোভাব নিয়েই তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আমাদের সমর্থন জানাতে হবে।

আমাদের সাহায্য ও সমর্থনের মধ্যে যদি এই মনোভাব জড়িয়ে থাকে যে, আমরা তাদের উপর খবরদারি করছি বা তারা আমরা এক এবং এবার আমরা আবার মিলে যাব, তাহলে আমাদের সাহায্যের অন্য অর্থ তাদের কাছে দাঁড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশে যে জাতীয় অভ্যুত্থান গড়ে উঠেছে, সেই জাতীয় অভ্যুত্থানের মানসিকতাও আমাদের এই মনোভাবকে ভালভাবে নিতে পারবে না। ঠিক এই সময়ে এই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত হলে আমাদের দল মনে করে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করার পরিবর্তে নানা বিভ্রাট সৃষ্টি করবে। এর দ্বারা সেখানে স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরোধী শক্তিগুলোকেই শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। তার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আমাদের সাহায্য, আমাদের সহানুভূতি অনেকখানি

ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন তার দ্বারা বাস্তবে খানিকটা দুর্বল হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের অভ্যুত্থান আমরা দেখছি তার প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তা গড়ে ওঠার ইতিহাসও আমাদের খানিকটা আলোচনা করা দরকার। ভারতবর্ষকে এবং ভারতীয় জাতিকে জোর করে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করে যখন দুটো রাষ্ট্র স্থাপন করা হল এবং পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হল, দীর্ঘদিন ধরে সেই পাকিস্তান রাষ্ট্র চলতে চলতে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একটা চেষ্টা চলছিল এবং সেটা গড়েও উঠছিল। কিন্তু কতকগুলো কারণে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান মিলে এক পাকিস্তান জাতীয়তাবোধ ও মানসিকতা গড়ে উঠতে পারেনি। প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার দূরত্ব বিরাট এবং ভৌগোলিক দিক থেকে একে অপরের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংস্কৃতিগত অর্থেও একটা মিল গড়ে তোলা দুরূহ ব্যাপার হয়ে গেল। কারণ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত দিক থেকেও একের সাথে অপরের কোনও মিল নেই। তাছাড়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের বিকাশ, শিল্পোন্নয়ন এবং আর্থিক অগ্রগতির জন্য পূর্ববাংলাকে প্রায় একটি 'কলোনি'তে পর্যবসিত করে ফেলেছিল। পূর্ববাংলার লোকসংখ্যা সমস্ত পাকিস্তানের লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববাংলা থেকে যা আয় হত, তার সিকিভাগ খরচ হত পূর্ববাংলার জন্য। আর বাকি সমস্ত চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে। ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কলোনিগুলিকে যেমন কাঁচামালের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে নিজের দেশের উন্নতি ও বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করে এবং সেগুলিকে পদানত করে রাখে, ঠিক তেমনি এক দেশ ও এক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে সেইরকম কলোনি বা উপনিবেশে পরিণত করেছিল।

কিন্তু এই ঔপনিবেশিক শোষণের উপলব্ধি এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে প্রথম দিকে গড়ে ওঠেনি এবং এক পাকিস্তানের মানসিকতা পূর্ববাংলার মানুষের মন থেকে একদিনেই ভেসে যায়নি। পূর্ববাংলার মানুষেরা দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেদের পাকিস্তানি বলেই ভেবেছে। কিন্তু ভাষাকে ভিত্তি করে, সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নকে ভিত্তি করে পূর্ববাংলার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জনমত গড়ে উঠতে থাকে এবং বিভিন্ন দাবি উত্থিত হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই আন্দোলনগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ ও ঐতিহাসিক গতি কোন দিকে তা ধরতে পারেননি। একদিকে আন্দোলনগুলোকে জবরদস্তি রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে দমন করতে চেয়েছেন আর অন্যদিকে ধর্মীয় জিগির তুলে পাকিস্তানের একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধের ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে খাড়া রাখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে ওঠে না।

জাতি হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক প্রোডাক্ট (সৃষ্টি)। ইতিহাসের গতিপথে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার প্রবল আকুলতা থেকে একটি ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে আর্থিক কেন্দ্রীকতা এবং একটি কেন্দ্রীয় ধারণা গড়ে ওঠে, সেই কেন্দ্রীয় ধারণাকে ভিত্তি করে ভাষা, সংস্কৃতি এবং একটি সার্বিক আর্থিক উন্নয়নকে সামনে রেখে একটা জাতি ইতিহাসের পরিণতি হিসাবে গড়ে ওঠে। সমস্ত আধুনিক জাতিগুলি গড়ে ওঠার এই হচ্ছে পিছনকার ইতিহাস। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে পাকিস্তানকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে নিয়ে জোর করে একটা দেশ করা না হলে পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ মিলেই একটা গোটা জাতি হিসাবে আজ ইতিহাসে বিরাজ করত। কিন্তু ভারতবর্ষ, যা একটা জাতি হিসাবে ইতিহাসের গতিপথে গড়ে উঠেছিল, রাজনীতির দাবাখেলায় তা দুটো জাতিতে, দুটো দেশে, দুটো দেশাত্মবোধক মনোভাব নিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কিন্তু পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হওয়ার পরেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এক দেশাত্মবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হল না, ভাষা ও সংস্কৃতিকে মেরে দিয়ে শুধু ইসলামিক রাষ্ট্রের নামে ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতীয়তার মনোভাব পাকিস্তানের দুই অংশে গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আপ্রাণ চেষ্টা করলেও বাস্তবে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটল দু'ভাগে বিভক্ত জাতীয়তাবাদের রূপ নিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় মানসিকতা গড়ে উঠল একভাবে, আর পূর্ব পাকিস্তান, আজ যাকে বাংলাদেশ বলা হচ্ছে, তার জাতীয় মানসিকতা গড়ে উঠতে আরম্ভ করল আলাদাভাবে। এই যে আলাদাভাবে বাংলাদেশের মানসিকতা পূর্ববাংলার ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে আলাদা করে গড়ে উঠল, এ একটা নতুন জাতীয়তাবোধ। যদিও সাথে সাথে একথা কোনওমতেই ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবোধ পাকিস্তান জাতীয়তাবোধেরই একটি ধারা।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে যদি আলাদাভাবে ধরা যায়, তাহলে অবশ্য দেখা যাবে যে, পাকিস্তান সম্পর্কে দেশাত্মবোধ সেখানেও এক এবং অখণ্ডরূপে বিরাজ করে না। কারণ, তার ভিতরেও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শাসন-জুলুমের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষুব্ধ মনোভাব এবং পাঞ্জাবি মুসলমান উপজাতির প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অন্যান্য উপজাতিগুলোর মধ্যে বিরাট বিক্ষোভ বর্তমান। তাহলেও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক কন্টিগুইটি (সংলগ্নতা) থাকার জন্য সেখানে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে এই বিক্ষোভ বাংলাদেশের মতো এত তীব্র রূপ নিয়ে ও এত ব্যাপক আকারে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় মনোভাব গড়ে উঠতে পারেনি। এই ভৌগোলিক কন্টিগুইটি না থাকার জন্য একই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে দুটো ভৌগোলিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে ঔপনিবেশিক শোষণের ও গোলামির জ্বালা এবং অত্যাচারিতের অনুভূতি একটা জাতীয় মনোভাব নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। ফলে বিভিন্ন উপজাতিগুলিকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানে যদিও খানিকটা অখণ্ডতা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বজায় রাখতে পেরেছে, কিন্তু সেই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদেরই আর একটি ধারা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের রূপে আলাদাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবোধ পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের জাতীয় অভ্যুত্থান, দেশপ্রেমের অভ্যুত্থান এবং দেশাত্মবোধের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ একটা নতুন জাতি হিসাবে জন্ম নিয়েছে। একে আর এখন পাকিস্তানের অংশ বলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রূপ নিয়ে নিয়েছে এবং পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ববাংলা হয়ে পড়েছে একটি স্বতন্ত্র জাতি। পূর্ববাংলার এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং ভিন্ন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যদি জোর করে তাকে দমন করার চেষ্টা করে বা আজ যদি কোনওভাবে বাংলাদেশের এই জাতীয় অভ্যুত্থানকে দমন করতে সক্ষমও হয় তাহলেও মনে রাখতে হবে পূর্ববাংলায় নতুন জাতীয়তার উন্মেষ হয়েছে। এই বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য বারবার মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সে শেষ পর্যন্ত কায়েম করবেই। কোনও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই আজকের দিনে শেষ পর্যন্ত পুরনো কায়দায় পদানত করে রাখা যায় না।

তবে একথাও সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে, পূর্ববাংলায় যে জাতীয় অভ্যুত্থান হয়েছে, পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের মধ্যেই যেহেতু তার জন্ম, তাই এই জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্যে পাকিস্তান সম্বন্ধে দরদবোধ এবং মমত্ববোধ পূর্ববাংলার মানুষের ভাবনায় আজও জড়িয়ে আছে। ফলে আমাদের মধ্যে যাঁরা এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে দুই বাংলা এক করার আওয়াজ তুলছেন বা এই আন্দোলনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা আলাদা স্বার্থ হিসাবে দুই বাংলা এক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনোভাবনা ঠিক এরকম নয় এবং ঠিক এরকমভাবে তাঁরা এ জিনিস চাইছেনও না। এক আমরা ছিলাম এবং আবার একদিন আমরা এক হব একথা ঠিক। কিন্তু এমনি করে নয়। এমনি করে এই মুহূর্তে এক করবার চেষ্টা করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনই মার খেয়ে যাবে। যাঁরা দুই বাংলা এখনই এক করার স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের একথা সবসময় মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ, এই দুই দেশেই যদি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোও গড়ে ওঠে তাহলেও সঙ্গে সঙ্গে এই দুই দেশের সীমা তুলে দিয়ে ঐক্যবিধান করা যাবে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পাশাপাশি দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের জাতীয় সীমা তুলে দেওয়া যায় না। জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং সীমা বিলোপ করার অধিকার শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ এসে যায় না। একথা মনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হয়ে গেলেও এবং দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কন্টেন্ট (চরিত্র) সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক হলেও যেহেতু আজও তার ফর্ম (রূপ) জাতীয়, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলোর এই ন্যাশনাল ফর্ম, এই জাতীয় রূপ, ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত হয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ জাতীয় সীমা বিলোপ করা কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। জোর করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই জাতীয় সীমা তুলে দিয়ে ঐক্যবিধান করতে গেলে সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যেই পরস্পর ঠোকাঠুকি লাগবে। কারণ, এর ফলে সেখানে একের উপর অপরের আধিপত্য ও জবরদস্তির মনোভাবের প্রশ্ন দেখা দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আত্মাভিমান, যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে খাদ হয়ে মিশে আছে — জোর করে পরস্পরকে মেলাতে গিয়ে তা সমাজতন্ত্র

থেকে আলাদা হবার চেষ্টা করবে। ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মার খাবে।

পরস্পর মিলব আমরা সুদূর ভবিষ্যতে, যেদিন সমস্ত মানবসমাজ,সমস্ত দেশ একটা মানবজাতিতে মিলে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র মিলে, বিশ্ব বিপ্লব সফল হবে, একটা বিশ্ব মানবসভ্যতা কায়েম হবে। তার আগে যে জাতি একবার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়ে গেল আমাদের কাজ হচ্ছে সেই জাতির অগ্রগতিতে এবং বিকাশে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করা। আমাদের এখনই মিলে যাওয়ার মনোভাবের প্রয়োজন নেই। বর্তমানে এই মনোভাব দুই দেশের জনগণের পক্ষেই ক্ষতিকারক। তাই আমার অনুরোধ, যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করছেন, তাঁরা ভলান্টিয়ার-এর মনোভাব নিয়েই তা করুন।

আমার একথার মানে এই নয় যে, বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে আমাদের কোনও স্বার্থই জড়িয়ে নেই। আমাদের একমাত্র স্বার্থ হচ্ছে, যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি বিপ্লবী সরকার কায়েম হয়, তাহলে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে তা একটি উপযুক্ত সহায়ক শক্তি হবে। অন্তত আমরা আশা করব, বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক যা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে চলবে না। যে রাষ্ট্র স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৃহত্তর মুক্তিআন্দোলনগুলোকে সমর্থন করবে, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হবে, দেশকে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র এবং প্রগতির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ফলে আমরা তা চাই। স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাদেশে যদি টুঙ্কু আবদুর রহমানের মতো একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দুঃখিত হব। কিন্তু আবার একথাও ঠিক যে টুঙ্কু আবদুর রহমানের মতো একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতাটাই আমরা চাইব না এটাও হতে পারে না।

কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেখানে কী ধরনের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটা সেই দেশের জনগণের বিষয়, আন্দোলনকারীদের বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশের জনসাধারণ যদি বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'মডারেট' নেতৃত্বকে ক্ষমতায় বসায়, তাহলে আমাদের অথবা কোনও বহিঃশক্তির দ্বারা তাকে বানচাল করতে যাওয়ার চেষ্টা হলেই তা গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনকেই বিপর্যস্ত করে দেবে। নেতৃত্বের চরিত্র কী, তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু নেতৃত্বের চরিত্র যাই হোক, বাংলাদেশের বর্তমান আন্দোলন যে স্বাধীনতার আন্দোলন সে ব্যাপারে যদি কোনও দ্বিমত না থাকে, তাহলে সমস্ত সৎ মানুষ, সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষকে এই স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে হবে।

কী ধরনের সরকার তারা এখনই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্রের চরিত্র শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা তাদের আন্দোলনের মধ্যে নেতৃত্বের চরিত্র কী রয়েছে এবং গণআন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তর কোথায় রয়েছে, তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে। তাছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলো, যারা পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে একত্রে মিলেমিশে লড়ছে, তাদের মধ্যে জনতার উপর কার প্রভাব এবং সংগঠন বেশি এবং বিশেষ করে আজকের দিনে সশস্ত্র সংগ্রামে কারা নেতৃত্ব দিতে পারবে তার উপরেও সেখানকার ভবিষ্যৎ সরকারের চরিত্র অনেকখানি নির্ভর করবে। কারণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পাকিস্তানি সশস্ত্র, জবরদস্ত, জঙ্গি, বর্বর একটা মিলিটারি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্তমানে অহিংস আন্দোলন, মিছিল, ধর্মঘট প্রভৃতি গণআন্দোলনের বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হয়ে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছে এবং সেখানে জনতাকে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ফলে, যারা সেখানে একত্রে মিলেমিশে স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে তাদের মধ্যে যে দল সবচেয়ে নিষ্ঠার সাথে ও যোগ্যতার সাথে কনসিসটেন্টলি (ধারাবাহিকভাবে) নেতৃত্ব দিয়ে এই সশস্ত্র যুদ্ধের প্রক্রিয়াগুলোকে বাস্তবে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে পারবে, তারাই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে যাবে। আজ সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে যে নেতৃত্বই থাকুক, যোগ্যতার সাথে এই সশস্ত্র সংগ্রামকে যে দল এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতে যেতে বাধ্য।

এখানে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, বাংলাদেশে যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত, তাঁদের কাছে আমি বলতে চাই। সেখানে বর্তমান সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধের অংশীদারদের একটা অংশের মধ্যে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা ধূমায়িত বিক্ষোভের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশেও আমরা দেখছি, বিপ্লবী বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে একদল এমনও বলছেন যে, মুজিবুর রহমান

বিদেশের দালাল। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সাথে মুজিবুর রহমানের সংযোগ এবং চীনের সাথে ইয়াহিয়ার বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে দেখে হয়তো তাঁরা একথা বলছেন অথবা, সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে মুজিবুর রহমান লড়বেন কিনা, এ নিয়ে সম্ভবত তাঁদের মধ্যে সংশয় আছে, তাই তাঁরা এভাবে প্রচার করছেন। একটা কথা তাঁরা ভেবে দেখছেন না যে, যেহেতু বিভিন্ন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সাথে তাঁর যোগাযোগ আছে, সেহেতু তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনটাই সাম্রাজ্যবাদীদের একটা চক্রান্ত — একথা বললে বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনেরই বিরোধিতা করতে হয়। একথা ঠিক, এখনও পর্যন্ত মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যতটুকু সংবাদ আমরা পেয়েছি, তাতে তাঁকে একজন মডারেট লিডার (মধ্যপন্থী নেতা) বলেই আমাদেরও মনে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এতবড় একটা বৃহৎ পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় অভ্যুত্থানে মুজিবুর রহমানই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বর্তমানে অবস্থান করছেন। ফলে নানা প্রশ্ন তুলে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বকে যাঁরাই বর্তমানে ডিসক্রেডিট (হেয়) করবার কোনও চেষ্টা করবেন, জনমানস থেকে তাঁরা যে শুধু বিচ্ছিন্ন হবেন তাই নয়, এমনকী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে বর্তমানে যে সংহতি আছে, সেই সংহতিকেই তাঁরা দুর্বল করবেন। এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি বর্বর সামরিক গোষ্ঠীর হাতকেই বাস্তবে শক্তিশালী করতে সাহায্য করা হবে। তাই নেতৃত্বের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে অন্তর্বিরোধ বা মতবিরোধ যাই থাকুক, আমরা মনে করি সেই বক্তব্যগুলোকে বর্তমান সময়ে সামনে নিয়ে এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনতার যে ঐক্য গড়ে উঠেছে, সেই ঐক্যের প্রশ্নটিকে কোনওমতেই পিছনে ফেলে দেওয়া চলতে পারে না।

একটা কথাই বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে আমাদের পক্ষ থেকে, মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকেও বড় করে তোলা দরকার বলে আমরা মনে করি। তা হচ্ছে, বাংলাদেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তার এক ইঞ্চি নিচে নেমে কোনও মীমাংসা হবে না। কারণ, আমেরিকা এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে এ ব্যাপারে একটা চক্রান্ত চলছে, আমরা লক্ষ করছি। তারা দেখছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি শেষ পর্যন্ত রোখা না যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে সমর্থন করতেই হবে। কিন্তু তার আগেই ইউ এন ও'র মাধ্যমে মধ্যস্থতা করে যদি একটা কনফেডারেশনের মারফত বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাথে বেঁধে রাখা যায়, তাহলে সেটাই হবে তাদের স্বার্থরক্ষার অর্থে অথবা স্বার্থরক্ষার দিক দিয়ে সবচাইতে ভাল। ফলে এই ব্যাপারে আমেরিকান অফিসিয়াল লবি বর্তমানে খুবই সক্রিয়। এইসব ফর্মুলা বের করবার জন্য বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলোর রাজধানীতে তাদের বহু পাকা মাথা ঘুরছে। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে।

ফলে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ সার্বভৌম জাতীয় স্বাধীনতার নিচে এক ইঞ্চি নামা চলবে না — এই স্লোগান বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আজ সেখানে সবচাইতে বড় করে তোলা দরকার। যেকোনও নেতা, স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যেকোনও অংশ বা দল পূর্ণ স্বাধীনতার নিচে বা তার থেকে কম কোনও শর্তে আলোচনার প্রশ্ন তুলবে, তারা যেই হোক, বা যে নেতৃত্বই হোক, তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যারাই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের বর্তমান লড়াইতে সাহায্য দেবে, তাদের রাজনৈতিক মতবাদ, ধ্যানধারণা, আদর্শ যাই থাকুক না কেন, তাদেরকেই এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একথা যদি মনে হয় যে, মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হলে স্বাধীনতাটাই তিনি কাঁচিয়ে দেবেন তাহলে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নেই তাঁকে বাঁধতে হবে। যারাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে লড়তে চাইবে তাদের সবাইকে নিয়েই ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বাংলাদেশে বর্তমানে গড়ে তুলতে হবে। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। মুজিবুর রহমান প্রথম অবস্থায় বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চেয়েছেন এবং তার জন্যই চেষ্টা করেছেন একথা ঠিক। কিন্তু পরে তিনি নিজেই বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছেন। ফলে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব মডারেট নেতৃত্ব হলেও তার সঙ্গে মিলেই ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বর্তমান সময়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, বর্তমান সময়ে নেতৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে বিভেদকে তাঁরা যেন

বড় করে না তোলেন। কারণ, তার দ্বারা বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনকেই কার্যত তাঁরা দুর্বল করে দেবেন।

তাছাড়া সেখানকার বিপ্লবী শক্তিকে একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, তাঁরা যদি এই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চান তাহলে শুধু মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এই নেতৃত্ব তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ বিপ্লবী নেতৃত্ব কাড়াকাড়ি করে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটিই রাস্তা আছে। বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত হবে, সেই ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের ঐক্যকে রক্ষা করে যদি তার ভিতরে আদর্শগত সংগ্রাম তাঁরা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারেন, আর যে সশস্ত্র লড়াই দীর্ঘদিন ধরে হয়তো সেখানে চলবে সেই লড়াইতে যদি যোগ্যতম রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা তাঁদের থাকে, তাহলে এই ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত তাঁদের হাতেই যাবে। কেউ রুখতে পারবে না। আর মুজিবুর রহমান নিজেই যদি সেই নেতৃত্ব দেন, তাহলে কারোরই আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। সেই নেতৃত্বের অধীনেই সকলকে চলতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব একজন ফিউডাল লর্ড (সামন্ত প্রভু) দিচ্ছেন বলে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করা যায় না। যারা করে তারা মূল বিষয়বস্তুকেই বানচাল করে দেয়। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মনে রাখতে হবে, নেতৃত্বের প্রশ্নে কাড়াকাড়ি করে মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে গেলে পাকিস্তানের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যে জাতীয় অভ্যুত্থান মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ে গড়ে উঠেছে, তাকেই দুর্বল করা হবে, দ্বিধাবিভক্ত করা হবে এবং তার দ্বারা পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর হাতকেই শক্তিশালী করা হবে।

বাংলাদেশের ব্যাপারে চীনের ভূমিকা নিয়েও খানিকটা আলোচনা হওয়া দরকার বলে আমি মনে করছি।* কারণ, আমাদের দেশের বুর্জোয়া কাগজগুলোর কল্যাণে জনসাধারণের একাংশের মধ্যে তো বটেই, এমনকী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এমন দলগুলির মধ্যেও এ ব্যাপারে নানা ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে যারা পরিচিত চীন-বিরোধীচক্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তারা যেমন একদিকে চীনের সাথে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে চীন সরকারের বাংলাদেশের ব্যাপারে ভূমিকা সম্পর্কে নানা রকম অপপ্রচার চালাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত নকশালপন্থী বিপ্লবীরা পাকিস্তানের সাথে চীনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক দেখে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে চীন এখনও পর্যন্ত নীরব থাকার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে চলেছেন এবং বাংলাদেশের গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটাকেই সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত সরকারের একটা চক্রান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করছেন !

আমি মনে করি চীনের এই ধরনের কাজ মূলত পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ কনট্রাডিকশনকে (দ্বন্দ্ব) বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করার কৌশল হিসাবে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে। অনেকে হয়তো মনে করেন চীনের এই নীতি একটা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। তা সে যাই হোক চীনের এই নীতিকে কে কীভাবে বোঝে না বোঝে আমি সে কনট্রোভার্সির (বিতর্ক) মধ্যে বর্তমানে যেতে চাইছি না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছি যে, চীন সরকারের বহু দিনের পরিশ্রম ও সাকসেসফুল ডিপ্লোম্যাটিক এফর্ট-এর (সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টা) জন্যই পাকিস্তান 'সিয়াটো'র (SEATO) মেম্বার হওয়া সত্ত্বেও এবং আমেরিকার উপর অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনামে আগ্রাসনের পক্ষে আমেরিকা পাকিস্তানকে কোনওমতেই কমিট (রাজি) করাতে পারেনি। চীনের সাকসেসফুল ডিপ্লোম্যাটিক এফর্ট তাকে উল্টো দিক থেকে টেনে রেখেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী যত বড় প্রতিক্রিয়াশীলই হোক না কেন, ইম্পিরিয়ালিস্ট ক্যাম্প-এর (সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের) কনট্রাডিকশনকে কারেকটলি হ্যান্ডল্ (সঠিকভাবে পরিচালনা) করার জন্য এবং পাকিস্তানকে যতটা সম্ভব আমেরিকার প্রভাব থেকে টেনে বাইরে রাখার উদ্দেশ্যেই চীন বর্তমানে পাকিস্তানের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে কোনওমতেই নষ্ট হতে দিতে চায় না। আবার এই সম্পর্ককে বজায় রেখে চলতে হচ্ছে বলেই চীন বাংলাদেশের ন্যাশনাল লিবারেশন স্ট্রাগলকে (জাতীয় মুক্তি আন্দোলন) সমর্থন করে না এবং ভবিষ্যতে দরকার হলে করবে না এটা তার থেকে কোনওমতেই কনক্লুড (সিদ্ধান্ত) করা যায় না।

চীনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন না করা — এই ব্যাপারটাকে আমি

---

* ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও আয়োজিত যুব সমাবেশে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে চীনের ভূমিকা সম্পর্কিত বক্তব্য এখানে সংযোজিত হয়েছে।

যেভাবে বুঝেছি তা আপনাদের কাছে সংক্ষেপে রাখছি। চীন দেখছে যে, শুরু থেকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামি লিগ ও মুজিবুর রহমানের মতো মডারেটদের হাতে থাকার ফলে গোড়া থেকেই জনসাধারণকে সংগঠিত করে আর্মড স্ট্রাগল (সশস্ত্র সংগ্রাম) বা ব্যাপক আকারে আর্মড রেজিসটেন্স (সশস্ত্র প্রতিরোধ) গড়ে তোলার কোনও প্রস্তুতি সেখানে গড়ে উঠতে পারেনি। তাই মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটা এখনও মূলত অ্যাজিটেশনাল ফর্ম-এ (বিক্ষোভের রূপে) রয়েছে। কার্যকরীভাবে ও ব্যাপকভাবে আর্মড স্ট্রাগল বা আর্মড রেজিসটেন্স বা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির ভিতর থেকে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতেও খুবই কম। অথচ জিওগ্রাফিক্যাল এবং লজিস্টিক অ্যাডভান্টেজ (ভৌগোলিক এবং সৈন্য ও সমরসম্ভার চলাচলের সুবিধা) এমন ধরনের নয় যাতে চীন সরাসরি সাহায্যের দ্বারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আর্মড স্ট্রাগল গড়ে তুলতে এবং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি গড়ে তুলতে কার্যকরীভাবে কোনওরূপ সাহায্য করতে পারে। ফলে, চীন দেখছে যে, তার দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনকে আন্দোলনের এই মুহূর্তে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করাটা বাস্তবে একটা মৌখিক সমর্থনেই দাঁড়িয়ে যাবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পিছনে একটা নৈতিক সমর্থনের যে মূল্য ততটা ছাড়া আর কোনও কার্যকরী মূল্যই তার থাকবে না। বরং এর দ্বারা কতকগুলি উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। (১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্তমান মুহূর্তে চীন খোলাখুলিভাবে সমর্থন করলে মুজিবুর রহমান ও আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে আমেরিকা ও ব্রিটেন সহ বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকারি ও বেসরকারি মহলে যে সমর্থন কাজ করছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আজ যে সমর্থন এর পিছনে রয়েছে এবং ভারত সরকার যতটা উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করছে তা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। (২) উপরন্তু চীনের বাংলাদেশের ব্যাপারে জড়িত হওয়াকে উপলক্ষ করে ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশের ব্যাপারেও আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে সরাসরি নাক গলাতে পারে। (৩) চীন এটা ভালভাবেই জানে যে, তারা স্বাধীনতা সংগ্রামকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করলেই পাকিস্তান তা মেনে নেবে না। উপরন্তু আজ যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের চাপ পাকিস্তানের উপর এই ব্যাপারে কাজ করে চলেছে সেই প্রক্রিয়ায় খানিকটা বাধার সৃষ্টি করা হবে এবং আমেরিকা, ব্রিটেন সহ সোভিয়েটের মতো শক্তিগুলি, যাদের মধ্যস্থতায় একটা রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমে মুজিবুরের মতো মডারেটপন্থীদের হাত দিয়ে হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের একটা সম্ভাবনা রয়েছে সে পথেও অহেতুক কতকগুলি কূটনৈতিক বাধার সৃষ্টি করা হবে মাত্র। তাই চীন হয়তো ভাবছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলাদেশে প্রোট্র্যাকটেড আর্মড স্ট্রাগল (দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম) চালিয়ে যাওয়ার মতো বাস্তব অবস্থা ভিতর থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে খোলাখুলিভাবে কিছু বললে উপকারের চেয়ে বর্তমান মুহূর্তে অনিষ্টই বেশি করা হবে। (৪) অন্যদিকে, যে পাকিস্তানকে চীন দীর্ঘদিন ধরে সাকসেসফুল ডিপ্লোম্যাটিক এফর্ট-এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে অন্তত কিছুটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে তাকে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদের কোলে পুরোপুরি ঠেলে দেওয়া হবে।

এইসব দিকগুলো বিবেচনা করেই হয়তো চীন বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশের সমর্থনে কোনও কিছু খোলাখুলিভাবে না বলাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে চীনের এখনই খোলাখুলিভাবে কিছু না বলার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে এক্ষুনি এরূপ মনে করা ঠিক হবে না যে, চীন মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে না বা তার বিরোধিতা করছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে একদিকে চীনের অর্থপূর্ণ নীরবতা এবং অন্যদিকে পাকিস্তানের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের দেশের চীনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের অভ্যন্তরে এই ব্যাপারে চীনের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছিল কিছুদিন আগে তার প্রতিবাদ করে চীন একটা প্রোটেস্ট নোট (প্রতিবাদ লিপি) ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। এই প্রোটেস্ট নোট-এর ভাষা সযত্নে পরীক্ষা করলে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে বর্তমান নীরবতা সত্ত্বেও চীনের মনোভাবনার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। চীন তাদের প্রোটেস্ট নোট-এর এক জায়গায় বলেছে "ইন্ডিয়া ইজ স্ল্যান্ডারিং এগেন্স্ট আস দ্যাট উই আর সাপোর্টিং দ্য পাকিস্তান রেজিম এগেনস্ট দ্য ফ্রিডম ফাইটারস অব ইস্ট পাকিস্তান" (ভারতবর্ষ আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে যে, আমরা নাকি পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন করছি)। এই নোটে 'ফ্রিডম

ফাইটার' (মুক্তিযোদ্ধা) শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। একটু সতর্কভাবে পড়লে কারোরই দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে এই মুহূর্তে খোলাখুলিভাবে সমর্থন না করা এবং পাকিস্তানের সাথে নানাভাবে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা — এই কাজগুলি যে কোনওদিক দিয়েই মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করা বোঝায় না, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের ঝানু কূটনীতিবিদেরা এবং বুর্জোয়া কাগজগুলি কিন্তু একথা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এবং বুঝতে পেরেছে বলেই তারা বাংলাদেশের ব্যাপারে অত্যুৎসাহ প্রকাশ করে চলেছে এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা সেট্‌লমেন্ট-এর (মীমাংসা) পথ যত তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় তার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ, তারা জানে মুক্তিযুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের পথে পরিচালিত হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা আন্দোলনে মডারেটপন্থী নেতৃত্ব হঠে গিয়ে বিপ্লবী নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটবে এবং তা শেষ পর্যন্ত চীনের প্রভাবে চলে যাবে। আর এটা বুঝতে পেরেই তাদের এত মাথা ব্যথা। তা না হলে, সকলেরই একথা জানা আছে আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলি সর্বত্র মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করে চলেছে। অথচ, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলি কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন এবং এই ব্যাপারে একটা মীমাংসার আপ্রাণ চেষ্টা করার একটাই উদ্দেশ্য, তা হল, বাংলাদেশে জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে যখন একবার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন শুরু হয়েছে তখন আজকের দিনে আর একে শেষ পর্যন্ত দমন করা যাবে না। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় এরা এই কথাটা বুঝতে পেরেছে। আন্দোলনের বর্তমান নেতৃত্ব মডারেটপন্থী মুজিবুর রহমান ও আওয়ামি লিগের হাতে থাকতে থাকতেই একটা রাজনৈতিক সেটলমেন্ট-এর দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরের মারফত যদি স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা পরিসমাপ্তি ঘটানো যায়, তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরেও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং হয়তো বা পাকিস্তানের সঙ্গেও বাংলাদেশকে খানিকটা জুড়ে রাখা সম্ভব হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত না গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটাই চীনের প্রভাবে চলে যায়, এই আশঙ্কাই প্রধানত এদের এই সমস্ত তথাকথিত শুভ প্রচেষ্টার পিছনে কাজ করে চলেছে। এই চিন্তাটাই যে বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ এবং বুর্জোয়া কাগজগুলির কার্যকলাপ ও প্রচারের পিছনে কাজ করে চলেছে সে সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য এবং বিদেশি কাগজগুলির বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি। যা থেকে আশা করি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এ ব্যাপারে চীনের ভূমিকাকে এরা কীভাবে দেখছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতিনিধি গার্ডিয়ান পত্রিকা পাকিস্তানকে এই বলে অ্যাডভাইস করেছে (পরামর্শ দিয়েছে) যে, 'যদি তোমাদের পক্ষে বর্তমানের এই অভ্যুত্থানকে সাপ্রেস (দমন) করা সম্ভবও হয় তা হলেও ইউ মাস্ট নট ফরগেট (তোমাদের একথা কিছুতেই ভোলা উচিত নয়) যে, এই আন্দোলন বারবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। ফলে, বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখনও সময় থাকতে স্বাধীনতার দাবিকে মেনে নিয়ে স্বাধীনতা দিয়ে দাও।' অর্থাৎ তারা বলতে চাইছে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ার আগেই সময় থাকতে থাকতে আওয়ামি লিগের ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভদের (নির্বাচিত প্রতিনিধি) সাথে পলিটিক্যালি সেটল (রাজনৈতিক বোঝাপড়া) করা দরকার। তাদের মনোভাবনা অনেকটা এইরকম যে, পাকিস্তান মূর্খামি করেই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। গোড়াতেই মুজিবুরের ছয় দফা দাবি মেনে নিলে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টিই হতে পারত না। কিন্তু যখন একবার এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তখন সেখান থেকে ফেরার আর কোনও উপায় নেই। এখন যদি পাকিস্তান আবার গোঁয়ার্তুমি করে তাহলে শুধু স্বাধীনতা দিতে হবে তাই নয়, বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্কই থাকবে না। হয়তো আর একটা ভিয়েতনাম তৈরি হবে এবং গোটা বাংলাদেশ চীনের খপ্পরে পড়ে যাবে। ফলে আমেরিকা সহ কোনও পুঁজিবাদী দেশের পক্ষেই এ জিনিস কাম্য হতে পারে না।

এই সব বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি নিজেদের স্বার্থের তাগিদেই চীনের এই ব্যাপারে ভূমিকাকে যথার্থভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি গার্ডিয়ান পাকিস্তানকে উদ্দেশ করে আরও বলেছে, 'তোমরা বলছ যে চীন তোমাদের বন্ধু। কিন্তু আগামীকাল যদি তোমাদের জেনারেলরা মুক্তিযোদ্ধাদের চীনা অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে লড়তে দেখে অবাক হয়ে যায় এবং ভাবতে বসে যে চীন বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে চীনের অটোমেটিক রাইফেল পেল, তবে তাদের ইডিয়েট জেনারেল বলা ছাড়া আর

আমাদের কোনও গত্যন্তর থাকবে না।'

প্যারিসের একটা কাগজও প্রায় অনুরূপভাবেই পাকিস্তানকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, 'তোমরা ভাবছ চীন তোমাদের বন্ধু কাজেই চীন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পিছনে দাঁড়াবে। দেখা যাচ্ছে চীনের রাজনীতি তোমরা মোটেই বুঝতে পারনি।' ঠাট্টা করে প্যারিসের এই কাগজটি এক জায়গায় বলেছে যে, 'চীন যখন বাংলাদেশের ব্যাপারে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছে যে, ডোন্ট ওয়ারি (দুশ্চিন্তা কোর না) আমি তোমার পিছনে আছি, তোমাকে যদি কেউ বিপদগ্রস্ত করে তাহলে আমি দেখে নেব — একথা যদি তোমরা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বিশ্বাস কর তবে তোমাদের অবস্থাও অনেকটা সেই গল্পের রুগির মতোই হয়ে দাঁড়াবে।' গল্পটি তারা উল্লেখ করেছে। গল্পটি হল একজন রুগি আসলে হার্ট ট্রাবল-এ (হৃদরোগ) ভুগছে। সে তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে গিয়েছে। ডাক্তার তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, ডোন্ট ওয়ারি, আই শ্যাল কিওর ইওর লিভার (কিছু ভাববেন না, আমি আপনার লিভার সারিয়ে দেব)। প্যারিসের এই পত্রিকাটি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে চীন তোমাদের যে আশ্বাসগুলি দিয়েছে তা অনেকটা ঐ ডাক্তারের দেওয়া আশ্বাসের মতো।

দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকাতেও একজন বিদেশি করেসপন্ডেন্ট (সাংবাদিক) সম্প্রতি চাইনিজ রিড্‌ল্‌ (চীনা হেঁয়ালি) নামে একটি ফিচার (প্রবন্ধ) লিখেছেন। সেখানেও তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একই কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। একজন বুর্জোয়া সাংবাদিক হয়েও ইয়াহিয়ার প্রতি চীনের নানা আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও বাংলাদেশ সম্পর্কে চীনের বর্তমান ভূমিকাকে কোনও দিক দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা হিসাবে তিনি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেননি। বরং তাঁর ধারণা, যদি সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয় তবে চীনই বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন করবে। তার জন্য ঐ ভদ্রলোক পাকিস্তানকে সময় থাকতে সাবধান হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পিছনে চীনের হাত আছে এটা আশঙ্কা করেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, অবিলম্বে যদি বাংলাদেশের ব্যাপারে তোমরা পাকিস্তানকে চাপ দিয়ে একটা সেটলমেন্ট করে দিতে না পার তবে অদূর ভবিষ্যতে গোটা বাংলাদেশই চীনের খপ্পরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ, ফরাসি, আমেরিকান পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে সোভিয়েট পর্যন্ত সকলেই পাকিস্তানকে একই কথা বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছে। সকলেরই এক আশঙ্কা যে, শেষ পর্যন্ত না গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটাই চীনের প্রভাবে চলে যায়। এত সব সত্ত্বেও সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল আমাদের দেশের তথাকথিত বিপ্লবীরা ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এটা ধরতেই পারছেন না। অন্যদিকে যে ভারত সরকার আজকাল নানা প্রগতিশীল কথা বলছেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন, হয় তাঁরাও এটা বুঝতে পারেননি, কিংবা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে চীনের মনোভাব বুঝতে পারা সত্ত্বেও চীনের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার চালাচ্ছেন আন্দোলনের মধ্যে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাববৃদ্ধিকে রোখার উদ্দেশ্যে।

এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন — তারা যদি সত্যি সত্যিই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকরীভাবে এবং নিঃস্বার্থভাবে সমর্থন ও সাহায্য করতে চায় তবে চীনই হতে পারে ভারতের পক্ষে এমনকী সোভিয়েটের চেয়েও এ ব্যাপারে একমাত্র নির্ভরশীল মিত্রশক্তি। ফলে, চীনের সাথে ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তোলা, ভারতবর্ষের অগ্রগতি ও বিকাশের প্রশ্নটির কথা বাদ দিলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কার্যকরীভাবে সমর্থন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলে তাকে রক্ষার প্রশ্নেও একটি অত্যন্ত জরুরি কাজ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

কাজেই আমাদের দেশে চীনের বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রচার চলছে যে, চীন মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে আছে, আমি খোলাখুলি আপনাদের কাছে বলছি, এ কথা বিশ্বাস করতে অন্তত আমার বাধছে।

বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ভারত সরকারের ভূমিকাও খানিকটা আলোচনা হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ, ভারতবর্ষের জনসাধারণ হিসাবে বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আমাদের যত সমর্থনই থাকুক, ভারত সরকারের কোনও কার্যকর ভূমিকা ছাড়া তাদের বর্তমানে যে সাহায্যের প্রয়োজন,

তার তুলনায় আমরা কতটুকু করতে পারি ? আমরা যা পারি তা হচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যদি আমাদের চায় এবং ভারত সরকার যদি আমাদের যেতে দেয়, তাহলে আমরা হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সেখানে পাঠাতে পারি। তারা সীমান্তের ওপারে গিয়ে তাদের সাথে লড়তে পারে জান দিতে পারে। আর পারে টাকাপয়সা ওষুধপত্র তুলে দিতে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে যে সাহায্য আজ সব চাইতে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে সেখানকার মুক্তিফৌজকে গেরিলা কায়দায় অসংখ্য সশস্ত্র দুর্ধর্ষ বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে কার্যকরভাবে সাহায্য করা। এগুলোর জন্য যা প্রয়োজন তা আমাদের দেশের জনসাধারণ কার্যকরীভাবে দিতে পারে না। এর জন্য যে সাহায্য দরকার তা দিতে পারে একমাত্র ভারতীয় রাষ্ট্র, ভারতবর্ষের সরকার।

তাই ভারতের জনসাধারণ হিসাবে আমাদের সব সময়ই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে কোনওমতে দায়সারা গোছের একটা সাহায্য দিলাম, সরকারের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব কাজ করতে না পারে। এ হলে কিছুতেই চলবে না। যে ধরনের সাহায্য আজ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, দরকার হলে তেমন সাহায্যই দিতে হবে। রিস্ক (ঝুঁকি) খানিকটা নিতেই হবে। তবে মাথা খারাপ করে রিস্ক নেওয়ারও আমি পক্ষপাতী নই। বর্তমানে অনেকখানি রিস্ক্ নেওয়ার মতো অবস্থা আছে বলেই আমি মনে করি। যদি আমরা ভুল পথে সাহায্য না করি, কোনওরূপ মিসকনসেপশন (ভুল ধারণা) থেকে না করি এবং অন্য কোনও আলটিরিয়ার মোটিভ (সুদূরপ্রসারী মতলব) থেকে না করি তাহলে আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকখানি রিস্ক নিতে পারি বলেই আমার ধারণা। কোনও কোনও মহল থেকে ভয় করা হচ্ছে যে, তেমন পরিস্থিতিতে হয়তো চীন আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে এসে যাবে। এগুলি কোনও কার্যকর কথাই নয়। প্রথমত, আমি বিশ্বাসই করি না যে, চীন সত্যিকারের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে আছে। আমার বিশ্বাস করতে বাধছে। আমি অন্য দলগুলো যেমন ভাবে ভাবছে, তাদের মতো ভাবছি না। আমি খুব ভালভাবে লক্ষ করে দেখেছি যে, চীন এ ব্যাপারে যে সব কথা বলছে তার ভাষা, যে ভাষায় আমরা কথা বলছি তার থেকে ভিন্ন ধরনের হলেও, একেবারে অপরিচিত ভাষায় চীন কথা বলছে এ কথাও আমি বলতে পারি না। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বেই খানিকটা আলোচনা করেছি এবং এ ব্যাপারে কিছু কিছু তথ্য আমি বিদেশি লেখকদের লেখা থেকে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে হলে যে ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন ঠিক সেই ধরনের সাহায্য যদি আমরা ভারত সরকারকে দিয়ে করাতে চাই, তাহলে আমাদের নিজেদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতিকে কেন্দ্র করে দৃঢ় ভিত্তির উপর সর্বপ্রথমে দাঁড় করানো দরকার। এটা আমি মনে করি বাংলাদেশকে সমর্থন করার ব্যাপারে সবচেয়ে জরুরি প্রাথমিক কাজ। যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলে একটা কাজের কাজ হবে। সরকার যা করার করবে। তার জন্য হিল্লিদিল্লি আমরা কেউ কম করছি না। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন কারেক্ট ফুটিং-এ (সঠিক নীতির উপর) প্রতিষ্ঠিত না থাকলে আমাদের সরকার সাহায্য করার নামে এমন অনেক কাজ করে ফেলতে পারে যা নট ইন কনফরমিটি উইথ দ্য ডিজায়ার অব দি ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল অর্থাৎ যা ভারতীয় জনগণের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা ভারতের জনসাধারণ ঠিক যে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জনসাধারণকে সমর্থন করতে চাই, আমাদের সরকার যেহেতু একচেটে পুঁজিপতি স্বার্থের প্রতিভূ সেইহেতু জনগণের সেই উদ্দেশ্যের পরিবর্তে ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিদের যে এক্সপ্যানসনিস্ট ডিজায়ার (সম্প্রসারণবাদী মনোভাব) রয়েছে গভর্নমেন্টের পলিসির মধ্যে, স্বভাবতই তা প্রতিফলিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে এবং বাংলাদেশের সংগ্রামকে এইড (সাহায্য) করার ব্যাপারেও স্বভাবতই এই মোটিভ (মতলব) কাজ করতে পারে। কাজেই আমরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত জনসাধারণকে ভারত সরকারকে দিয়ে যেমনভাবে নিঃস্বার্থ সাহায্য করাতে চাইছি সেটা করাতে হলে তার একমাত্র গ্যারান্টি হল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটা সচেতন ও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ন্যূনতম এই স্ট্যান্ডার্ডটি দেশের অভ্যন্তরে কার্যকর না থাকলে ভারত সরকার স্বভাবতই বাংলাদেশের আন্দোলনকে সমর্থন করা এবং তাকে সাহায্য করার নামে সেই দেশের উপর খবরদারি বা অন্তত ট্রেড অ্যান্ড কমার্স-এর (ব্যবসা ও বাণিজ্য) স্বার্থে খানিকটা স্ফিয়ার অব ইনফ্লুয়েন্স (প্রভাবাধীন অঞ্চল) বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে এবং বাংলাদেশে একটি তাঁবেদার সরকার খাড়া করার চেষ্টা করতে পারে। সরকারের সাহায্যের পিছনে এই সব মোটিভগুলোর উপরে যদি রেসট্রেনিং এফেক্ট (নিয়ন্ত্রণ) আনতে হয় এবং সরকারি সাহায্যকে রাইট ডিরেকশনে (সঠিক পথে) রাখতে হয় তাহলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও

গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং আন্দোলনের মধ্যে সরকারি সাহায্যের পিছনকার এই মোটিভগুলো সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটা ন্যূনতম আচরণবিধি ও ন্যূনতম ইডিয়লজিক্যাল কোহেশন (আদর্শগত সংহতি) গড়ে তুলতে হবে। কারণ ভারতীয় পুঁজিবাদ পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় অনুন্নত হলেও ইতিমধ্যেই একচেটে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে ও নিজেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে, স্ট্যাটিসটিকস-এর (পরিসংখ্যান) সহায়তায় অতি সহজেই তা প্রমাণ করা যায়। পশ্চিমী দেশগুলোর ইম্পিরিয়ালিস্ট ডিজাইন-এর (সাম্রাজ্যবাদী ছক) মতো অত ব্যাপকতা তার না থাকতে পারে, কিন্তু লিমিটেড এক্সপ্যানসনিস্ট ডিজায়ার (সীমিত সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা) ভারতীয় একচেটে পুঁজিবাদের নেই, একথা আমি স্বীকার করি না। কারণ, তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অন্য ঘটনাই প্রমাণিত হচ্ছে।

তাই আমি মনে করি, যখন আমরা ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছি যে, এখনই কিছু করা দরকার, ডু সামথিং অ্যান্ড ডু ইট কারেজিয়াসলি (কিছু কর এবং তা সাহসের সাথে কর) যতরকমভাবে এবং যেমন করে সাহায্য করা দরকার, তেমনভাবে তোমাকে সাহায্য করতে হবে, তখন আমাদের দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে যে দিকটির প্রতি সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তা হল, আমাদের দেশের জনসাধারণের অ্যাসপিরেশন-এর (আকাঙ্ক্ষা) সাথে সঙ্গতি রেখে সরকার এই কাজগুলি করছে কিনা। আর এর সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি, আমাদের এখানে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট-এর ইউনিটি (গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য) এবং একটা ন্যূনতম আদর্শগত মান, একটা ফার্ম পলিসি (সুদৃঢ় নীতি), যেগুলো বর্তমানে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ল্যাক করছে (অভাব দেখা যাচ্ছে)। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারেও আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করা এবং সঠিক পথে চালানো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

কিন্তু, ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সহানুভূতিসূচক অনেক কথাই বলেছে, অথচ মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে স্বাধীন একটি সরকার গঠন করা সত্ত্বেও নানা বাহানা তুলে আজ পর্যন্ত সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। ভারত সরকার শুধু লক্ষ করছে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া বা চীন এই স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দেয় কি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত সরকারের এত কথা ভাববার দরকার কী ? অন্যান্য রাষ্ট্র এই মুক্তিযুদ্ধকে কী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছে সেটা তাদের বিষয়। ভারত সরকার তো নিজে এই যুদ্ধকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে স্বীকার করেছে। তাহলে বাংলাদেশের এই স্বাধীন সরকারকে তারা স্বীকৃতি দিচ্ছে না কেন ? বাংলাদেশের এই স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেখানকার মুক্তিফৌজকে সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে সর্বরকমে সাহায্য করা তো ভারতীয় রাষ্ট্র এবং সরকারের অবশ্য কর্তব্য ছিল। অথচ ভারত সরকার চালাকি করে সেই দায়-দায়িত্ব এড়াতে চাইছে। মিষ্টি কথায় নানাভাবে কিছু টাকাপয়সা, ওষুধপত্র তারা সাহায্য দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু খোলাখুলি সেখানকার স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাপকহারে অস্ত্রশস্ত্র ও দরকার হলে সামরিক সাহায্য দিতে ভয় পাচ্ছে। ভারত সরকারের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, তারা হয়তো ভাবছে, যদি মুক্তিফৌজ পরাস্ত হয়ে যায় এবং পাকিস্তানের মিলিটারি শাসকগোষ্ঠী যদি এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করে দিতে পারে, তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে তার যে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীনতা আন্দোলন জয়যুক্ত হবে কি পরাস্ত হবে, তা দেখে কি ভারত সরকার তাকে সমর্থন জানাবে ? ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে তাদের বড় বড় কথা বলার দরকার কী ? এর দ্বারা তো ভারত সরকার ভণ্ডামির পরিচয় দিচ্ছে, শুধু চালবাজি করে যাচ্ছে। শুধু হাতে রাখতে চাইছে মুক্তিযোদ্ধাদের। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করে তাহলে দেখাবে ভারতবর্ষ কত সাহায্য করেছে। আর যদি মুক্তিযোদ্ধারা হেরে যায়, তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথেও সম্পর্ক থাকবে, তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। এই তো চালাকি। তাই আমাদের দল মনে করে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কার্যকরী সাহায্যের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে কিছু হবে না। তার জন্য তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে এবং সেই পথে দেশের মানুষকে অগ্রসর হতে হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে ভারতবর্ষের জনসাধারণ হিসাবে এই মুহূর্তে আমাদেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। আমাদের সর্বাগ্রে উচিত এই মুক্তিসংগ্রামে যাতে আমরা কার্যকরীভাবে সাহায্য

করতে পারি, তার জন্য একটি সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দ্রুত তৈরি করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে চান, তাঁরা দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক তালিকায় নাম লেখান। আমাদের দল ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করেছে। যদি এইভাবে একটা শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আমরা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে মুক্তিযুদ্ধে যেতে প্রস্তুত ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সশস্ত্র শক্তিতে রূপান্তরিত করে বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে কার্যকরীভাবে দাবি উত্থাপন করতে পারি। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যদি তৈরি না থাকে, তাহলে অসংগঠিত কতকগুলো লোক সেখানে গিয়ে ভিড় করে হৈ-চৈ করে মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা শুধু অসুবিধাই সৃষ্টি করব, কার্যকর সাহায্য কিছুই করতে পারব না। ফলে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা এবং সর্বতোভাবে তাকে তৈরি রাখা আমাদের পক্ষে একটি অবশ্যকরণীয় কাজ। তাছাড়া, খাদ্য,বস্ত্র, ওষুধ এইগুলো তাদের সাহায্যের জন্য আমাদের পাঠানো প্রয়োজন। কিন্তু সাথে সাথে এই সাহায্য যাতে বাজে লোকের হাতে না পড়ে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। কারণ, নানারকম শক্তি সেখানে কাজ করছে। কাজেই যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা এবং যেসব সংগঠনগুলো ও পার্টিগুলো এই মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার, আমাদের সাহায্য যাতে সঠিকভাবে তাদের হাতে গিয়ে পড়ে সেটা দেখা দরকার। সেজন্য যে সমস্ত বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সাহায্য তুলছে তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, সেই সমস্ত সাহায্য কোনও রাজনৈতিক দলের মারফত, অথবা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি যদি আস্থা না থাকে তাহলে আমাদের দেশের সরকারের মারফত সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা যেন তারা করে।

সর্বশেষে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের গণআন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি খানিকটা বিচার করা দরকার বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আমি মনে করি, আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক দলগুলির অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। কারণ, বাংলাদেশের এই মুক্তিসংগ্রামে সেখানকার জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলগুলি যেখানে সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মরণপণ সংগ্রাম করে চলেছে, সেখানে আমাদের দেশের গণআন্দোলন আজ নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহে দ্বিধাবিভক্ত। আমাদের দেশের গণআন্দোলনের ভিতরেই আজ প্রতারণা বাসা বেঁধেছে। তার প্রতি স্তরে বিভ্রান্তি। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে নৈতিক মান, রাজনৈতিক নীতিবোধ, আদর্শগত মান ধসে যেতে বসেছে। আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া নিয়ে এখানে লড়াই করি একথা সত্য কিন্তু সেই লড়াইয়ের সাথে সাথে আমরা যারা এই লড়াইতে অংশগ্রহণ করছি, সমাজের প্রতিও তাদের যে একটা কর্তব্যবোধ এবং দায়িত্ববোধ আছে, তা ভুলে যাই। এই সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে রুচিগত মান যা আমরা প্রতিফলিত করছি তা হচ্ছে, কেউ আমার বন্ধু হলে বা আমার মতকে সমর্থন করলে আমরা তাকে যা হয় বলে তারিফ করি। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন নেতা এবং সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও কারোর সাথে আমাদের সামান্য মতপার্থক্য হলে তাকে যেকোনও ভাষায় গালাগালি করতেও আমাদের এতটুকু বাধে না। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক নীতিবোধ ও রুচিগত মান আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। এর আগেও এই কথা বহু জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আমি বলেছি। তা হচ্ছে, আমাদের দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমরা পরিচালনা করেছি, তার মধ্যে বহু ত্রুটি ছিল, একথা আমরা জানি। সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সমাজের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ধর্মীয় অন্ধতার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম আমরা চালাতে পারিনি। অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত একটা জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধ আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালনা করেনি। বরং ধর্মের পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় সংস্কার — এই সমস্ত জিনিসগুলি আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেই মিশে ছিল। ফলে একটা ধর্মমিশ্রিত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আমরা চালিয়ে গিয়েছি। সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের ঝান্ডা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আমরা তুলে ধরতে পারিনি। অথচ সেই সময়েও আমরা দেখেছি, এত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও স্বাধীনতার আন্দোলনটা যেহেতু দেশের পক্ষে তখন প্রগতিমূলক আন্দোলন ছিল, ফলে তার সামনে একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ছিল। একটা নীতি এবং নৈতিকতার মান সেদিন গণআন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যুবসমাজ এবং মানুষগুলোকে পরিচালনা করেছে। সেদিন দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজ

শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হয়নি। তারা বুলেটের মুখে প্রাণ দিয়েছে, অশালীন আচরণ করেনি।

কিন্তু আজ দেখছি, তথাকথিত কমিউনিস্টদের, সমাজতন্ত্রীদের, বিপ্লবী পার্টি হিসাবে বড় পার্টি বলে যারা পরিচয় দেয় তাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। দেশের যুবসমাজের উপর এবং জনগণের উপর তাদের প্রভাব বেড়েছে। তারা নিজেরাও তাই দাবি করে। অথচ আমরা জানি, বিপ্লবী আদর্শ উচ্চ রুচি এবং সাংস্কৃতিক মানকে প্রতিফলিত করে। ফলে তাদের আদর্শ যদি সত্যিকারের বিপ্লবী আদর্শ হয়, তাহলে তার প্রভাবে যে মানুষগুলো জেগে উঠল তাদের তো এই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় উন্নত সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানই প্রতিফলিত করার কথা। তাহলে তাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের এই অধঃপতন কেন ? কেন তাদের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দেশ্যহীনতা ? কেন এই উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাব তাদের প্রভাবিত যুবসমাজকেও আজ ছেয়ে ফেলছে ? তারা গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করে একথা ঠিক, অধিকার নিয়ে স্লোগানও দেয়, কিন্তু সমাজের প্রতি কোনও কর্তব্যবোধ এবং দায়িত্ববোধ অনুভব করে না। সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে স্তরে কেন এই মানসিকতা আমাদের দেশে কাজ করছে ? যত এই সমস্ত তথাকথিত বিপ্লবীদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে, তাদের পার্টির শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে, তত যুবসমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অশালীন আচরণ, আত্মম্ভরিতা ও দম্ভ বাড়ছে এবং রুচিগত মান নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তাহলে এর দ্বারা একথা কি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না যে, শক্তি তাদের বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু সে শক্তি হচ্ছে দুষ্টশক্তি, তা গণতান্ত্রিক শক্তি বা যথার্থ বিপ্লবী শক্তির শক্তিবৃদ্ধি নয়। কারণ, বিপ্লবী শক্তির শক্তিবৃদ্ধি হলে অন্তত যে মানুষগুলো তাদের প্রভাবে চলছে তার মধ্যে নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত। নতুন নীতি, নৈতিকতা আর আদর্শে তারা টগবগ করত। তারা প্রাণ দিত, কিন্তু কেউ তাদের উচ্ছৃঙ্খল, অশালীন বলতে পারত না।

বাংলাদেশে আজ যে মানুষগুলো স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তাদের মুখে আজও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এবং বিপ্লবের মহান আদর্শের খৈ ফুটছে না। হয়তো আছে ভিতরে ভিতরে, আমরা শুনতে পাচ্ছি না। তারা সেখানে বর্তমানে যে সংগ্রাম করছে, তা হচ্ছে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম, যা আমরা করেছি ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত। তারা সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে লড়ছে, তারা জীবন দিচ্ছে। তারা নিজেরা মরছে, আবার মারছেও শত্রুকে। কিন্তু তারা সংযত, তারা অত্যাচারী নয়। অথচ আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মতপার্থক্য হলে আমরা রুচি ভুলে যাই, শালীনতা ভুলে যাই। মতবাদের পার্থক্য হলেই আমরা মানুষকে অসম্মান করি, হেনস্থা করি, মারি শত্রুমিত্র নির্বিচারে এবং অসভ্যের মতো ব্যবহার করি।

বাংলাদেশের আন্দোলন আর আমাদের দেশের আন্দোলনগুলোর মধ্যে এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ কী, তাও বিচার করে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ উচ্চ আদর্শ বলে ঘোষিত ছিল, মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে সেই জাতীয়তাবাদের আদর্শই কাজ করে চলেছে। কিন্তু এদেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং একটি স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর জাতীয়তাবাদের সেই আদর্শের কোনও কার্যকারিতা আমাদের দেশের সমাজজীবনে আজ আর নেই। তা আমাদের দেশের মানুষকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। অথচ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচিত বৃহৎ পার্টিগুলো আদর্শের নামে এখানে যা প্রচার করছে, তাও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়, তা স্লোগান-সর্বস্বতা মাত্র। আমরা জানি, যেকোনও আদর্শ, যেকোনও দর্শন, যেকোনও বড় বড় মতবাদের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার নৈতিক মান এবং সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে। মার্কসবাদ একটা মহান বিপ্লবী আদর্শ। ফলে এই মহত্তম বিপ্লবী আদর্শেরও মর্মবস্তু এবং প্রাণসত্তা নিহিত রয়েছে তার সংস্কৃতিগত মান এবং নৈতিক মানের মধ্যে। ফলে আমাদের দেশের তথাকথিত বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির হাতে পড়ে মার্কসবাদী আদর্শের সেই নৈতিক মান, বাংলাদেশে যারা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে তার থেকে যদি নিচু স্তরে নেমে গিয়ে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের দ্বারা পরিচালিত গণআন্দোলন আমাদের দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে ?

জনসমর্থন বৃদ্ধির উদাহরণ দেখিয়ে আমাদের দেশের যে সমস্ত বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা তাদের নীতির সঠিকতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের দু'একটি ঘটনা আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এক-একটা সময়ের প্রবাহে মেকি বিপ্লবীদের, এমনকী প্রতিক্রিয়াশীলদের স্লোগানে পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে যায়, গোটা দেশ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এরকম ঘটনা ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে। এক সময় হিটলারের মতো মানুষ গোটা জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী থেকে বুদ্ধিজীবী

পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে প্রগতির স্লোগান, 'ডন অব দ্য নিউ এরা' (নবযুগের সূর্যোদয়) এই স্লোগানে পাগল করে তুলেছিল। তাহলে জনসমুদ্র, যা হিটলারের পিছনে একসময়ে জড়ো হয়েছিল, তা কি প্রমাণ করে যে হিটলার জার্মানির বিকাশ, অগ্রগতি, সমাজতন্ত্র এবং প্রগতির ঝান্ডার পিছনে জনতাকে জমায়েত করেছিল ? নাকি একথা সত্য যে, হিটলার সাময়িকভাবে হলেও জার্মানির জনসাধারণকে প্রগতির স্লোগানে বিভ্রান্ত করেছিল। সেই সময়ে গণচেতনার নিম্নমানকে খেয়ালে রেখে হিটলার অত্যন্ত সুকৌশলে এমন কতকগুলো স্লোগান জার্মানিতে তুলেছিল, যে স্লোগানের প্রকৃতি না বুঝতে পারার জন্য তাকেই জার্মানির অগ্রগতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রগতির একমাত্র পথ ভেবে তার দিকে জার্মানির সমস্ত মানুষ ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে গোটা জার্মানির সর্বনাশ হয়ে গেল।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা কী ছিল ? প্রায় বাংলাদেশের মতো ছোট একটা দেশ ইন্দোনেশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অভ্যুত্থানের আগে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল ত্রিশ লক্ষ। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে, পুলিশের মধ্যে, সরকারি প্রশাসনের স্তরে স্তরে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি ভাবছিল, বিপ্লব প্রায় তারা সেরেই এনেছে। আসলে তারা কী করেছে ? তারা বিপ্লব নিয়ে খেলা করেছে। এইভাবে পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে মিলেমিশে এবং তার প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে যারা বিপ্লব করতে যায়, তারা বিপ্লবের নামে যা করে তা হচ্ছে, গোটা পার্টিটাকেই শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে এক্সপোজ (উদ্‌ঘাটিত) করে দেয়। ইন্দোনেশিয়াতে সেই কাণ্ডটি ঘটেছিল। ফলে যখন প্রতিক্রিয়ার প্রবাহ এল, মিলিটারি বেঁকে দাঁড়াল, তখন পার্টিটা রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের সামনে ছত্রখান হয়ে গেল। কারণ, রাষ্ট্রের কাছে পার্টিটাকে এক্সপোজ করে দেওয়ার ফলে পার্টির কোনও কিছুই আর গোপন ছিল না রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে। এই ছিল তার ট্যাকটিক্যাল অর্থে অর্থাৎ যে কায়দায় তারা বিপ্লব করতে চেয়েছিল সেই দিক থেকে প্রধান ত্রুটি।

তাদের দ্বিতীয় ত্রুটি ছিল, তারা পার্টির শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে জনসাধারণের সংস্কৃতিগত এবং রুচিগত মান কোন স্তরে রয়েছে এবং তাদের সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ কতখানি তা বিচার করেনি এবং তাকে উন্নত করে তুলে ধরবার একটা প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়নি। আমাদের দেশেও তথাকথিত বৃহৎ বিপ্লবী পার্টির কর্মীরা যখন রাস্তা দিয়ে প্যারেড করে যাওয়ার সময়ে কোমর দোলাতে দোলাতে নানারকম অঙ্গ ভঙ্গি করতে করতে স্লোগান দিয়ে যায়, একটু তর্কবিতর্ক হলেই যাদের গলা দিয়ে অশ্লীল কথাবার্তা, বুকনি এবং গালি বেরিয়ে যায় তখনই ধরা পড়ে এই গণতান্ত্রিক শক্তির রুচিগত মান কোন স্তরে রয়েছে। জনসাধারণের এবং কর্মীদের রুচিগত মান যদি এই পর্যায়েই থেকে যায়, তাহলে সেই সমস্ত কর্মী ও জনসাধারণ, যারা স্লোগান দিয়ে তথাকথিত বিপ্লবী পার্টিদের ভোটে ক্ষমতায় বসায় এবং নামায়, মনে রাখা দরকার, তারা যেকোনও দিন আর একটা রাজনৈতিক প্রবাহে প্রতিক্রিয়ার শক্ত হাতিয়ার হয়ে যেতে পারে, যেমন ইন্দোনেশিয়ায় হয়েছে।

এই সমস্ত তথাকথিত বৃহৎ বিপ্লবী পার্টিগুলো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে একবারও ভেবে দেখছে না যে, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হত, তারা পার্টির দুঃসময়ে কীভাবে হারিয়ে গেল। তারাই তো সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা মাঠে-ময়দানে, মিছিলে মিছিলে ঝান্ডা নিয়ে, স্লোগান দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পিছনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যেদিন প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠল, ধর্মান্ধদের সাথে মিলে রাষ্ট্রশক্তি যখন পার্টিকে উচ্ছেদের অভিযানে নামল, তখন দেখা গেল গোটা দেশের সেই বৃহত্তর জনশক্তি ত্রিশ লক্ষ কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ত্রিশ লক্ষ সদস্যের বাইরে দেশের এই বৃহত্তর জনশক্তির মানসিকতা এবং তাদের মনের গতি কোন দিকে তা কোনওদিন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। কারণ ত্রিশ লক্ষের শক্তিতে তারা গরম ছিল। তারা একবারও খেয়াল করে দেখেনি যে, তাদের পার্টির সদস্য সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন, গোটা দেশের বৃহত্তর জনশক্তির তুলনায় তা মাইনরিটি।

এই কারণেই দুনিয়ার সমস্ত বড় বিপ্লবীরা এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার সময় যে জনশক্তি কার্যকরীভাবে রাস্তাঘাটে নেমে বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, দেশের বৃহত্তর জনশক্তির তুলনায় তা মাইনরিটি, এ কথাটা বিপ্লবী পার্টিকে সব সময় খেয়াল রাখতে হয়। এই বৃহত্তর জনশক্তির মানসিকতা ও মনের গতি কোন দিকে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার সময় কোনও বিপ্লবী পার্টিই সেটা অগ্রাহ্য করে চলতে পারে না। কারণ, এই বৃহত্তর জনশক্তি যেহেতু সংগঠিত নয়, তাই লক্ষ লক্ষ

জমায়েতের শাসনে সে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে, ইচ্ছে থাকলেও কোনও কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না — একথা ঠিক। কিন্তু একথাও সত্য যে, সঠিক কায়দায় গণআন্দোলন পরিচালিত না হলে এবং এই গণআন্দোলনের মধ্যে ত্রুটি থেকে গেলে তার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে এই জনশক্তি বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। যদি কোনও পার্টি সময়মত জনসাধারণের এই মানসিকতা ধরতে না পারে এবং সেই অনুযায়ী নীতি, আচরণ ও কর্মপদ্ধতি সংশোধন না করে তাহলে তার অজান্তেই জনসাধারণের মধ্যে এই বিক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে এবং একদিন উপযুক্ত পরিবেশে তুফানের মুখে সেই পার্টিকে জনতা ফেলে দেয়।

আমাদের দেশের গণআন্দোলনেও আজ সেই বিপদই দেখা দিয়েছে। তাই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে আজ এত বড় করে দেখার আমাদের প্রয়োজন আছে। আমাদের নিজেদের আত্মমুক্তি, আত্মবিস্মৃতি থেকে আমাদের মুক্তি,আত্মম্ভরিতা থেকে আমাদের মুক্তি, সাংস্কৃতিক অধঃপতন থেকে আমাদের মুক্তির জন্য এবং আমাদের দেশের গণআন্দোলনের মানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার আছে। যদি আমরা তা নিতে পারি তাহলে আমাদের দেশের আগামীদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তা অনেক সাহায্য করবে।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭১
এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে
কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ।
২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।